

৪৭তম বিসিএস ব্যাখ্যাসহ উত্তর

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

প্রশ্ন ১. 'লুই ভগই গুরু পুছিঅ জান।' এখানে 'ভগই' শব্দের অর্থ-
ক) বলে খ) ভাবে গ) চায় ঘ) দেখে

উত্তর- বলে।

ব্যাখ্যা: লুইপার রচিত চর্যাপদের প্রথম পদের লাইন এটি। পদটি হলো-

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল।।
দিচ করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভগই গুরু পুছিঅ জান।।

বাংলা অর্থ- লুই বলেছেন, গুরুকে জিজ্ঞেস করে জান। ভগই অর্থ- বলে।

তথ্যসূত্রঃ চর্যাপদের অনুলিপি।

প্রশ্ন ২. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের অংশ নয় কোনটি?

ক) নৌকা খণ্ড খ) হার খণ্ড
গ) রাধা বিরহ ঘ) প্রণয় খণ্ড

উত্তর- প্রণয় খণ্ড।

ব্যাখ্যা: শ্রীকৃষ্ণকীর্তনঃ

• মধ্যযুগে রচিত বাংলা ভাষার প্রথম কাব্যগ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
গঠনগত বা আঙ্গিকগতভাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন একটি নাট্যগীতি বা বর্ণনাত্মক নাটকও বলা যায়। এখানে গীত বা গানের আকারে গাওয়া হত, আবার নাটকীয়তাও আছে। তাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে নাট্যগীতি বলা যায়। উল্লেখ্য, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বাংলা সাহিত্যের প্রথম একক গ্রন্থ। এর রচয়িতা বড়ু চন্ডিদাস।

• ১৯০৯ সালে (১৩১৬ বঙ্গাব্দে) বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাকিল্যা গ্রামে মল্লরাজগুরু বৈষ্ণবমহন্ত শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র বংশজাত শ্রী দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির গোয়ালঘর থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি আবিষ্কার করেন।

- ১৯১৬ সালে (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় পুঁথিটি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে পুঁথিটি ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্ল রায় রোডস্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালায় রক্ষিত আছে।

প্রধান চরিত্র তিনটি

- কৃষ্ণ (পরমাত্মা)
- রাধা (জীবাত্মা)
- বড়াই (এ দুয়ের সংযোগকারী অনুঘটক / দূতী)
- মোট ১৩ খন্ডে ৪১৮টি পদে এটি বিন্যস্ত।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মূল কাহিনী ভাগবত থেকে নেওয়া হলেও এতে বিভিন্ন পুরাণ এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দম-এর প্রভাব রয়েছে।

• ১৩ টি খন্ড হল

- জন্মখণ্ড,
- তাম্বুল খণ্ড,

- দানখণ্ড,
- নৌকাখণ্ড,
- ভারখণ্ড,
- ছত্রখণ্ড,
- বৃন্দাবন খণ্ড,
- কালিয়দমন খণ্ড,
- যমুনা খণ্ড,
- হার খণ্ড,
- বাণ খণ্ড,
- বংশী খণ্ড ও
- বিরহ খণ্ড।

তথ্যসূত্রঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, লাল নীল দিপাবলি ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা।

প্রশ্ন ৩. বিবৃত স্বরধ্বনি বলতে বোঝায় -

ক) যে স্বরধ্বনি উচ্চারণে ঠোঁট বেশি খোলে
খ) যে স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বা উঁচু হয়
গ) যে স্বরধ্বনি অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়
ঘ) যে স্বরধ্বনি উচ্চারণে বিকৃতি ঘটে

উত্তর: যে স্বরধ্বনি উচ্চারণে ঠোঁট বেশি খোলে।

ব্যাখ্যা: ঠোঁটের উন্মুক্তি অর্থাৎ স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে আমরা কী পরিমাণ হাঁ করছি তা নির্ধারণ করে স্বরধ্বনিকে নিম্নলিখিত চার ভাগে ভাগ করা হয়।

বিবৃত স্বরধ্বনি:

এ স্বরধ্বনির উচ্চারণে ঠোঁট সবচেয়ে বেশি খোলা থাকে।
বাংলা ভাষায় এ জাতীয় স্বর মাত্র একটি— আ।

অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি:

বিবৃত স্বরধ্বনির তুলনায় ঠোঁট কম খোলা রেখে উচ্চারিত স্বরধ্বনিগুলোকে এভাবে দেখানো হয়। যেমনঃ অ্যা, অ।

অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি:

সংবৃত স্বরধ্বনির তুলনায় ঠোঁট বেশি খোলা কিন্তু অর্ধ-বিবৃত স্বরধ্বনির তুলনায় কম খোলা থেকে অর্ধ-সংবৃত স্বরধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয়।
যেমনঃ এ, ও।

সংবৃত স্বরধ্বনি:

ঠোঁট সবচেয়ে কম খোলা থেকে উচ্চারিত স্বরধ্বনিগুলো এ জাতীয়।
যেমনঃ ই, উ।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ - নবম দশম শ্রেণী (২০১৯ সংস্করণ),
ভাষা-শিক্ষা - ড. হায়াৎ মামুদ।

প্রশ্ন ৪. মনোয়েল দ্যা আসসুম্পসাঁও অভিধান প্রকাশের আগে কত বছর ধরে শব্দ সংগ্রহ করেন?

- ক) ২-৩ বছর খ) ৫-৭ বছর
গ) ৯-১০ বছর ঘ) ১৪-১৫ বছর

উত্তর- ৯-১০ বছর।

ব্যাখ্যা: ম্যানুয়েল-দ্যা-আসুম্পসাঁও-এর ব্যাকরণ ও শব্দকোষ সম্পর্কে লেখক-গবেষক হাবীবুর রশীদ 'বাংলা অভিধানের কথা' নিবন্ধে লিখেছেন, 'বাংলা-পর্তুগিজ ও পর্তুগিজ বাংলা শব্দকোষটি (Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez, dividido em duas partes) ব্যাকরণের পরিশিষ্ট রূপে মুদ্রিত হয়েছিল। ব্যাকরণ অংশের পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল মোট ৫২৯। বইটি পর্তুগিজ রীতি অনুযায়ী রোমান অক্ষরে (বাংলায় মুদ্রণযন্ত্র তখনও অনাবিস্কৃত) লিসবন শহর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে। তবে লেখার আগে ৯-১০ বছর তিনি এর শব্দ সংগ্রহ শুরু করে ১৭৩৪ সাল থেকে সংকলন শুরু করেন।' গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার নাগরী গ্রামে 'সাধু নিকোলাসের ধর্মপল্লি'তে বসেই বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেছেন আসসুম্পসাঁও। এটিই হচ্ছে বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ। তবে এটি কোন ব্যাকরণগ্রন্থ ছিল না। কারণ এতে পর্তুগিজ অভিধানও ছিল।

প্রশ্ন ৫. 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রথমে কোন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়?

- ক) বিবিধার্থ সংগ্রহ খ) সংবাদ প্রভাকর
গ) মাসিক পত্রিকা ঘ) বঙ্গদর্শন

উত্তর: মাসিক পত্রিকা।

ব্যাখ্যা: প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রথম গ্রন্থ 'আলালের ঘরের দুলাল।' ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে 'মাসিক পত্রিকা'য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। কেউ বলেন, 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস গ্রন্থ। কারো মতে, উপন্যাস নয়, উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। অর্থাৎ এটি সার্থক উপন্যাস কি-না এনিয়ে বিতর্ক আছে। অনেকের মতে, 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সামাজিক নকশা। এখানে দেশীয় বক্ষ্যা শিক্ষা ব্যবস্থা, পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিশৃঙ্খলা নিয়ে লেখক নিজের অভিমত প্রকাশ করেছেন। তবে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার আলোকে উচ্চ আদর্শ সম্পন্ন জীবনগঠনকে লেখক স্বাগত জানিয়েছেন। কাহিনি বর্ণনায় কৌতুক আছে। এ গ্রন্থের গদ্যে লেখক সচেতনভাবে চলতি ভাষা প্রয়োগ করেছেন। উদ্যোগটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই গদ্যরীতি বাংলা সাহিত্যে আলালী রীতি নামে পরিচিত। আলালের ঘরের দুলাল কোন সার্থক উপন্যাস ছিল না, তবে উপন্যাস রচনার পথিকৃৎ ছিল।

তথ্যসূত্রঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, সৌমিত্র শেখর।

প্রশ্ন ৬. 'সকলের তরে সকলে আমরা/প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।' - কোন কবিতার অংশ?

- ক) পরার্থে খ) পাছে লোকে কিছু বলে
গ) বড় কে ঘ) সুখ

উত্তর: সুখ কবিতা।

ব্যাখ্যা: সুখ কবিতা ১৮৮০ সালে লেখা বিখ্যাত একটি কবিতা কামিনী রায়ের। এই কবিতা আলো ও ছায়া কাব্যগ্রন্থের কবিতা। আলো ও ছায়া কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ সালে। পরবর্তীতে ১৮৮৯ সালে সুখ কবিতার শেষের কয়েকটি লাইন নিয়ে পরার্থে নামে একটি কবিতা তার কবিতাবলী কাব্যগ্রন্থে যুক্ত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে পরার্থে স্বতন্ত্র কোন কবিতা নয় এটি সুখ কবিতার ই অংশ। সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

এই লাইনটি সুখ কবিতার শেষের লাইন।

• **কনফিউশান দুরীকরণ**— ক্লাস ৬ এর বোর্ড বইতে সুখ কবিতার শেষের লাইনে মোরা লেখা আছে। যা মূলত টাইপিং মিস্টেক। এছাড়াও অনেক বইতে পরার্থে নামে কবিতা ছাপা হয়েছে যেটা নিতান্তই সুখ কবিতারই অংশ। কামিনী রায় পরার্থে নামে কোন কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন নাই। সুখ কবিতার শেষের লাইনগুলো ব্যবহার করে পরার্থে নামে কবিতাবলী কাব্যগ্রন্থে যুক্ত করা হয়। বাস্তবে এমন কবিতা উনি লিখেননাই, এটা সুখ কবিতারই অংশ।

পরার্থে কবিতার লাইন

যাতনা যাতনা কিসেরি যাতনা?
বিষাদ এতই কিসেরি তরে?
যদিই বা থাকে যখন তখন
কি কাজ জানায়ে জগৎ ভরে?
লুকান বিষাদ আঁধার আমায়
মৃদুভাতি স্নিগ্ধ তারার মত,
সারাটি রজনী নীরবে নীরবে
ঢালে সুমধুর আলোক কত!
লুকান বিষাদ মানব হৃদয়ে
গভীর নিশীথ শান্তির প্রায়,
দুরাশার ভেরি, নৈরাশ চিৎকার
আকাঙ্ক্ষার রব
ভাঙে না তায়।
বিষাদ বিষাদ বিষাদ বলিয়ে
কেনই কাঁদবে জীবন ভরে?
মানবের মন এত কি আসার?
এতই সহজে নুইয়া পড়ে?
সকলের মুখ হাসি ভরা দেখে
পার না মুছিতে নয়ন ধার?
পরহিত ব্রতে পার না রাখিতে
চাপিয়া আপন বিষাদ ভার?
আপনারে লয়ে বিরত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

সুখ কবিতার শেষের লাইন

যাতনা যাতনা কিসের যাতনা?

বিষাদ এতই কিসের তরে?

যদিই বা থাকে যখন তখন

কি কাজ জানায়ে জগৎ ভরে?

লুকান বিষাদ আঁধার আমায়

মৃদুভাতি স্নিগ্ধ তারার মত,

সারাটি রজনী নীরবে নীরবে

ঢালে সুমধুর আলোক কত!

লুকান বিষাদ মানব হৃদয়ে

গভীর নিশীথ শান্তির প্রায়,

দুরাশার ভেরি, নৈরাশ চিৎকার

আকাজক্ষার রব

ভাঙে না তায়।

বিষাদ বিষাদ বিষাদ বলিয়ে

কেনই কাঁদবে জীবন ভরে?

মানবের মন এত কি আসার?

এতই সহজে নুইয়া পড়ে?

সকলের মুখ হাসি ভরা দেখে

পার না মুছিতে নয়ন ধার?

পরহিত ব্রতে পার না রাখিতে

চাপিয়া আপন বিষাদ ভার?

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে

আসে নাই কেহ অবনী পরে,

সকলের তরে সকলে আমরা

প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

সুতরাং, এটা পরিক্ষার দেখা যাচ্ছে লাইনগুলো একই। এজন্য এটার সঠিক উত্তর হবে সুখ।

তথ্যসূত্র: আলো ও ছায়া অরিজিনাল কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি।

প্রশ্ন ৭. কাজী নজরুল ইসলামের কোন গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত হয়নি?

ক) অগ্নিবীণা

খ) বিষের বাঁশি

গ) ভাঙার গান

ঘ) চন্দ্রবিন্দু

উত্তর: অগ্নিবীণা।

ব্যাখ্যা: শিশির কর তার 'নিষিদ্ধ নজরুল' গ্রন্থে নজরুলের বাজেয়াপ্ত হওয়া ৫টি গ্রন্থ উল্লেখ করেন।

⇒ যুগবাণী (১ম নিষিদ্ধ)

⇒ বিষের বাঁশি

⇒ ভাঙার গান

⇒ প্রলয় শিখা

⇒ চন্দ্রবিন্দু

অগ্নিবীণা কাব্য নিষিদ্ধ না হলেও এই কাব্যের রক্তস্বরধারিণী মা কবিতাটি নিষিদ্ধ হয়।

তথ্যসূত্র: নিষিদ্ধ নজরুল, শিশির কর।

প্রশ্ন ৮. জসীম উদ্দীনের 'কবর' কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত?

ক) বালুচর

খ) রাখালী

গ) ধানক্ষেত

ঘ) মা যে জননী কান্দে

উত্তর: রাখালী

ব্যাখ্যা: কবর কবিতাটি ১৯২৭ সালে কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এটি ১১৮ লাইনের কবিতা। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। এটি রাখালী কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। জসীমউদ্দিন ছাত্রাবস্থাতেই এই কবিতা রচনা করেন।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, সৌমিত্র শেখর ও রাখালী কাব্যগ্রন্থ।

প্রশ্ন ৯. গৌড়ী প্রাকৃত বলতে বোঝায়-

ক) গৌড় অঞ্চলের মুখের ভাষা

খ) গৌড় সাহিত্যের স্বাভাবিক রীতি

গ) গৌড় ভাষার লিখিত নমুনা

ঘ) গৌড় ভাষার বিকৃত উচ্চারণ

উত্তর: গৌড় অঞ্চলের মুখের ভাষা।

ব্যাখ্যা: ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, গৌড় অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা অর্থ প্রাকৃতজনের মুখের ভাষা থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। অর্থাৎ বাংলা ভাষার উৎপত্তি গৌড়ীয় প্রাকৃত থেকে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে, অর্থাৎ সপ্তম শতকে, গৌড়ী প্রাকৃত থেকে জন্ম নিয়েছিল আধুনিকতম প্রাকৃত বাংলা ভাষার। তাহলে দেখা গেল বাংলা ভাষার উৎপত্তি সরাসরি সংস্কৃত ভাষা থেকে হয়নি।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ; ভাষা-শিক্ষা, হায়াত মামুদ।

প্রশ্ন ১০. 'Glossary' শব্দের বাংলা পরিভাষা-

ক) জ্ঞাপনপত্র

খ) সর্বসাকল্যে

গ) শব্দার্থপঞ্জি

ঘ) গুদামজাত

উত্তর: শব্দার্থপঞ্জি।

ব্যাখ্যা: Glossary শব্দের বাংলা পরিভাষা- টীকাপুঞ্জ, শব্দার্থপঞ্জি।

তথ্যসূত্র: বাংলা একাডেমির প্রশাসনিক পারিভাষিক অভিধান।

প্রশ্ন ১১. 'ঐক্যমত' শব্দটি কোন বিবেচনায় অশুদ্ধ নয়?

ক) মতের ঐক্য - এভাবে সমাসসাধিত ধরলে

খ) একমত+য - এভাবে প্রত্যয়সাধিত ধরলে

গ) ঐক্য+মত - এভাবে উপসর্গসাধিত ধরলে

ঘ) ঐক্যমত শব্দটিকে পারিভাষিক শব্দ ধরলে

উত্তর: মতের ঐক্য - এভাবে সমাসসাধিত ধরলে।

ব্যাখ্যা: ঐক্যমত শব্দটি অশুদ্ধ। শুদ্ধ রূপ- ঐকমত্য। অশুদ্ধ হওয়ার কারণে এটার প্রকৃতি - প্রত্যয় ও পারিভাষিক অর্থ সঠিক হবে না। এই শব্দে উপসর্গ নেই। একমাত্র সমাস হিসেবে ধরলে এই অপপ্রয়োগকে শুদ্ধ বিবেচনা করা যায়।

ঐক্যমত - মতের ঐক্য (তৎপুরুষ সমাস)।

তথ্যসূত্র: ভাষা-শিক্ষা, হায়াত মামুদ ও বাংলা একাডেমির অভিধান।

প্রশ্ন ১২. ১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল-

- ক) বানানকে উচ্চারণের কাছাকাছি নেওয়া
- খ) বানানের ঐতিহ্যকে বজায় রাখা
- গ) বানানের নিয়ম প্রণয়ন করা
- ঘ) বানানে বিকল্প বর্জন করা

উত্তর: বানানে বিকল্প বর্জন করা।

ব্যাখ্যা: ১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বানান সংস্কারে একটি কমিটি গঠন করা হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে। এই বানান সংস্কার কমিটির পূর্ব প্রণীত বানান সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল ৩টি।

- ১. বানান যথাসম্ভব সরল ও উচ্চারণসূচক করা।
- ২. নতুন ও বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে বানান কাঠামো সুনির্দিষ্ট করা।
- ৩. একই শব্দের একাধিক বানান ব্যবহারের সংকট তৈরি হয় এজন্য তার বিকল্প বর্জন করে প্রত্যেক শব্দের বানান সুনির্দিষ্ট করা।

এই রিপোর্টটি ১৯৩৭ সালে ৩য় সংস্কারে প্রকাশ করা হয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বানানকে সংস্কার করে একটা সুনির্দিষ্ট রূপ দান করা। সুতরাং, প্রশ্নে প্রদত্ত অপশনগুলোর মধ্যে বানানে বিকল্প বর্জন করাই মূল উদ্দেশ্য ছিল।

• **কনফিউশান দূরীকরণ-** বানানে বিকল্প বর্জন করাও এক ধরনের বানান প্রণয়ন। বানান প্রণয়নের শত শত নিয়ম আছে। তার মধ্যে মাত্র ৩টা নিয়ম ও উদ্দেশ্যকে সংস্কার করাই ছিল ১৯৩৬ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার কমিটির কাজ।

তথ্যসূত্রঃ ১৯৩৬ সালের বানান সংস্কার মূল প্রতিবেদন।

প্রশ্ন ১৩. অভিধানে ং, ঃ, ঁ - এই বর্ণগুলোর অবস্থান কোথায়?

- ক) স্বরবর্ণের আগে
- খ) স্বরবর্ণের শেষে
- গ) ব্যঞ্জনবর্ণের শেষে
- ঘ) এদের নির্দিষ্ট অবস্থান নেই

উত্তর: স্বরবর্ণের শেষে।

ব্যাখ্যা: অভিধান অনুযায়ী বর্ণের ক্রম-

প্রথমে 'অ', তারপর 'আ', 'ই', 'ঈ', 'উ', 'ঊ', 'ঋ', 'এ', 'ঐ', 'ও', এবং শেষে 'ঔ'।

স্বরবর্ণের পরে 'ং' (অনুস্বার), 'ঃ' (বিসর্গ), এবং 'ঁ' (চন্দ্রবিন্দু) বসে।

তারপর ক, ক্ষ, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, ঢ, ন, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র।

তথ্যসূত্রঃ বাংলা একাডেমির অভিধান।

প্রশ্ন ১৪. পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে 'স্মরণ' শব্দের ক্ষেত্রে কোনটি ঘটে?

- ক) স-এর উচ্চারণ শ হয়ে যায়
- খ) ণ-এর উচ্চারণ ন হয়ে যায়
- গ) ম-ফলার উচ্চারণ ম হয়ে যায়
- ঘ) শুরুতে নাসিক্য উচ্চারণ হয় না

উত্তর: স এর উচ্চারণ শ হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা: পূর্ববঙ্গীয় ম ফলার উচ্চারণের ৫টি নিয়ম-

ক. পদের আদ্য ব্যঞ্জনবর্ণে 'ম'-ফলা সংযুক্ত হলে সাধারণত তার কোনো উচ্চারণ হয় না, তবে প্রমিত উচ্চারণে 'ম'-ফলাযুক্ত বর্ণটির উচ্চারণ সামান্য নাসিক্য-প্রভাবিত হয়ে ওঠে। যথা: স্মরণ (শরোন), শ্মশান (শশান), স্মৃতি (সৃতি), স্মারক (শাঁরোক) ইত্যাদি। অর্থাৎ, পূর্ববঙ্গীয় (ঢাকাইয়া, কুমিল্লা, নোয়াখালী ইত্যাদি) উচ্চারণে "স্ম" ধ্বনির শুরুতে "স" প্রায়শই "শ" ধ্বনিতে রূপ নেয়। তাই "স্মরণ" উচ্চারণ হয় "শরোন"। এজন্য, পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে স-এর উচ্চারণ শ হয়ে যায়।

খ. পদের মধ্যে বা অন্তে 'ম'-ফলা সংযুক্ত বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়ে থাকে। যথা: ছদ্ম (ছদ্দোঁ), পদ্ম (পদ্দোঁ), *আত্ম (আঁ), অকস্মাৎ (অকোশাত) ভস্ম (ভশোঁ), রশ্মি (রোশি), মহাত্মা (মহাঁ), আকস্মিক (আকোশিক্) ইত্যাদি।

গ. কিন্তু বাংলা ভাষায় পদের মধ্যে কিংবা অন্তে সর্বত্র 'ম' ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণটির দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় না; গ, ঙ, ট, ণ, ম এবং ল-এর সঙ্গে সংযুক্ত 'ম'-এর উচ্চারণ সাধারণত অবিকৃত থাকে। যথা: বাগ্মী (বাগ্মি), যুগ্ম (জুগ্মো), বাঙ্গুয় (বাঙ্গুয়), উন্মাদ (উন্মাদ), জন্ম (জন্মা), সম্মান (শম্মান), গুল্ম (গুল্মা) ইত্যাদি।

ঘ. যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত 'ম'-ফলার কোনো উচ্চারণ হয় না। যথা: সূক্ষ্ম (শুকখোঁ), লক্ষ্মী (লোক্সি), লক্ষণ (লখোন) ইত্যাদি।

ঙ. এছাড়া বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 'ম'-ফলাযুক্ত কতিপয় সংস্কৃত শব্দ আছে (কৃতঋণ শব্দ) যার বানান ও উচ্চারণ সংস্কৃত রীতি অনুযায় হয়। যথা: কুস্মাণ্ড (কুগ্মাণ্ডো) স্মিত (স্মিতো), সুস্মিতা (শুস্মিতা) ইত্যাদি।

তথ্যসূত্রঃ ভাষা শিক্ষা- হায়াত মামুদ ও বাংলা একাডেমির উচ্চারণ অভিধান।

প্রশ্ন ১৫. 'গড্ডলিকা প্রবাহ' বাগ্‌ধারার 'গড্ডল' শব্দের অর্থ কী?

- ক) নদী
- খ) স্রোত
- গ) ভেড়া
- ঘ) মশা

উত্তর: ভেড়া।

ব্যাখ্যা: গড্ডলিকা প্রবাহ বাগ্‌ধারার অর্থ - অন্ধ অনুকরণ।

গড্ডল অর্থ - ভেড়া।

ভেড়ার পালের মতো পরস্পরের অনুসরণ করা বা অপরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা থেকে এটার সৃষ্টি।

তথ্যসূত্রঃ বাংলা একাডেমির অভিধান।

প্রশ্ন ১৬. 'এমন পিরিতি কভু নাহি দেখি শুনি।/পরানে পরান বান্ধা আপনা আপনি।।' কার লেখা?

- ক) বিদ্যাপতি খ) চণ্ডীদাস
গ) জ্ঞানদাস ঘ) গোবিন্দদাস

সঠিক উত্তর - চণ্ডীদাস।

ব্যাখ্যা:

এমন পিরিতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরানে পরানে বান্ধা আপনা আপনি
দুহু কোরে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় কি মরিয়া ॥
জল বিনু মীন যেন কবছ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে।
ভানু কমল বলি সেহো হেন নয়।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রয়।
চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা ॥
কুসুমে মধুপ কহি সেহো নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল ॥
কি ছার চকোর চান্দ দুহু সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাসে কহে ॥

তথ্যসূত্র- চণ্ডীদাসের পদাবলী, শ্রী বিমানবিহারি মজুমদার।

প্রশ্ন ১৭. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পর্বে রচিত বাংলা বইগুলো-

- ক) সংস্কৃত বইয়ের অনুবাদ খ) ফারসি বইয়ের অনুবাদ
গ) ইংরেজি বইয়ের অনুবাদ ঘ) পণ্ডিতদের রচিত মৌলিক গ্রন্থ

উত্তর- সংস্কৃত বইয়ের অনুবাদ।

ব্যাখ্যা: অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পণ্ডিতদের লেখা সংস্কৃত, ইংরেজি ও ফারসি ভাষা থেকে অনুবাদকৃত গ্রন্থ। তবে সবচেয়ে বেশি অনুবাদ করা হয়েছে সংস্কৃত থেকে। এইগুলো মৌলিক রচনা নয়।

গোপাল হালদার লিখেছেন- পাত্রপাত্রীর বিষয় ভেদে কথোপকথনের ভাষা যে গুণ্ডর বা লঘু হবে, মাজিত বা স্কুল হবে, এমন কি বাংলা দেশে তা ফারসী ঘেঁষা বা সংস্কৃত মিশানো হয়ে থাকে, কেরি নিজেই তা উল্লেখ করেছেন। কেরির আরও একটি বই 'ইতিহাস মালা'। ১৮১২ সালে প্রকাশিত। এখানে প্রায় দেড়শ (১৫০) গল্প সংকলিত আছে। নানা উৎস থেকে গল্প সংগ্রহ করে অনুবাদ করেছেন এবং সংকলন করেছেন। এটাও তাঁরা মৌলিক রচনা নয়। কেরি সাহেবের সহকারী দুজন অগ্রণী লেখকের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার অন্যতম। অন্যজন রামরাম বসু। বাংলা গদ্যগ্রন্থের প্রথম লেখক ছিলেন তাঁরা। ১৮০১ থেকে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মৃত্যুঞ্জয় এই কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। সংস্কৃত এবং বাংলা, দুটো ভাষাতেই তাঁর পাণ্ডিত্য ছিলো। তাঁর চারখানা বই- বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২), রাজাবলি (১৮০৮); হিতোপদেশ (১৮০৮); বেদান্ত চন্দ্রিকা (১৮১৭) এবং প্রবোধ চন্দ্রিকা মৃত্যুর পরে ১৮৩৩ সালে ছাপা হয়। শেষের বইটিই মৃত্যুঞ্জয়ের শ্রেষ্ঠ রচনা বলা হয়। বইটি দীর্ঘদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য ছিলো। অন্য তিনটে বইই অনুবাদ, সংস্কৃত থেকে। মৌলিক গদ্য গ্রন্থ তখন বাংলায় ছিলো না, এই উদ্ভবযুগের লেখকদের তাই অনুবাদ করে একটা গদ্যের স্টাইল গড়ে তুলতে হয়েছিলো। স্টাইল-এর দিক থেকে প্রবোধচন্দ্রিকা তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা হলেও রাজাবলির ভাষা অনেক

সহজবোধ্য, সচ্ছন্দ। সেকালের পক্ষে এও একটা মস্ত গুণ। প্রবোধচন্দ্রিকা বইটি লোক জীবন আশ্রিত গল্পের সংকলন, তাই ভাষাও কৃত্রিমতাবর্জিত। 'হিতোপদেশ' বই-এর ভাষা অনেকটাই সংস্কৃত-অনুসারী। তবে রামরাম বসুর রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র মৌলিক রচনা। তথ্যসূত্রঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম; বাংলা সাহিত্য, স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম, পবিত্র মুখার্জী।

প্রশ্ন ১৮. সাহিত্যের রূপ ও রীতির বিচারে কোন গ্রন্থটি ব্যতিক্রম?

- ক) বাংলা কাব্য খ) দিবারাত্রির কাব্য
গ) শেষের কবিতা ঘ) নদী ও নারী

উত্তর- শেষের কবিতা।

ব্যাখ্যা: সাহিত্যের রূপ হলো সাহিত্যের বিভিন্ন ধরন, যেমন - কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প ইত্যাদি, আর রীতি হলো সেই রূপগুলো কীভাবে তৈরি করা হয়েছে, অর্থাৎ তাদের কাঠামো ও বিন্যাস। সহজভাবে বললে, রূপ হলো একটি বইয়ের আকার (যেমন উপন্যাস, কবিতা) এবং রীতি হলো সেই বইয়ের বিষয়বস্তু কীভাবে সাজানো হয়েছে। আমরা যদি অপশন গুলো বিশ্লেষণ করি-

ক. বাংলা কাব্য- বাংলা কাব্য বাংলা সাহিত্যের একটি ধরন বা রূপ। এই নামে কোন গ্রন্থ নেই। তাই এটি সঠিক উত্তর নয়।

খ. দিবারাত্রির কাব্য- দিবারাত্রির কাব্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস। বিখ্যাত উপন্যাস হলেও নামের সাথে কাব্য থাকায় অনেকেই এটিকে কাব্য ভেবে বসেন। এই উপন্যাসে ৩টি ভাগ রয়েছে। দিবারাত্রির কাব্যের গঠন সম্পর্কে স্বয়ং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশের ভূমিকায় লিখেছিলেন, 'দিবারাত্রির কাব্য পড়তে বসে যদি কখনো মনে হয় বইখানা খাপছাড়া, অস্বাভাবিক, তখন মনে রাখতে হবে এটা গল্পও নয়, উপন্যাসও নয়, রূপক কাহিনি। রূপকের এ একটা নতুন রূপ।' পড়তে গেলেও বারবার মনে হবে উপন্যাস পড়ছেন, না নতুন আঙ্গিকের রূপককাহিনি।

সুতরাং, সাহিত্যের রূপ ও রীতির বিচারে এটিকে একধরনের ব্যতিক্রমী সাহিত্য বলা যায়।

গ. নদী ও নারী- এটি হুমায়ুন কবিরের রচিত উপন্যাস। পদ্মানদীর তীরবর্তী মানুষের জীবন ও পদ্মাকে কেন্দ্র করে তাদের বেঁচে থাকার সংগ্রাম এর প্রধান পটভূমি। এটি সাহিত্যের রূপ ও রীতির বিচারে ব্যতিক্রমী সাহিত্য নয়।

ঘ. শেষের কবিতা - শেষের কবিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত একটি বিখ্যাত উপন্যাস। শেষের কবিতা রচনার পর পরই এটা নিয়ে এখন পর্যন্ত সমালোচনার শেষ নেই। এটিকে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কাব্যধর্মী উপন্যাস বলা হয়। এই উপন্যাসের নাম ও ধরন দুটাই ব্যতিক্রম। উপন্যাসটিতে রয়েছে পরতে পরতে কবিতা। এই উপন্যাসের ধরন সম্পর্কে ক্ষেত্রগুপ্ত বলেছেন, শেষের কবিতা বাংলা সাহিত্যে একটি বিরল কাব্যধর্মী উপন্যাস। এটিকে উপন্যাস বলা হলেও গঠন রীতিতে এটি একটি কাব্য।

সুতরাং, সাহিত্যের রূপ ও রীতির বিচারে প্রদত্ত অপশন গুলোর মধ্যে সবচেয়ে ব্যতিক্রমী গ্রন্থ হচ্ছে শেষের কবিতা।

তবে, প্রশ্নটি যদি এইরকম হত- বাংলা সাহিত্যে রূপ ও রীতির বিচারে নিচের কোনটি ব্যতিক্রম? তাহলে বাংলা কাব্য উত্তর হত।

তথ্যসূত্রঃ দিবারাত্রির কাব্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শেষের কবিতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; সাহিত্যের রূপ ও রীতি, কুস্তাল মিত্র।